কুরআনিক পিকচার অব দ্য ইউনিভার্স

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় ভিত্তি

মূল

প্রফেসর ইমেরিটাস ড. ওসমান বকর

ভাষান্তর

আব্দুল আউয়াল মিয়াঁ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী

সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং

(প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

কুরআনিক পিকচার অব দ্য ইউনিভার্স

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় ভিত্তি

ওসমান বকর

গ্রন্থস্বত্ব ©
প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পরিবেশক
বর্ণালী বুক সেন্টার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৫২৮২৩৬৮, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউস লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৫৪, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

বিআইআইটি পাবলিকেসন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৪৯, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: biitpublication@gmail.com

মূল্য
টাকা ৩০০.০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই জর্ডান হাশেমী রাজ্যের রাজধানী আম্মানস্থ রাজকীয় আল-বাইত ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক থ্যটকে তাদের উদার গবেষণা অনুদানের জন্য - যা আমাকে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের (তাফসির ইলমী) উদ্দেশ্যে একটা বড় ধরনের গবেষণা পরিচালনা করতে সক্ষম করে তুলেছে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক ও সমসাময়িক ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্ব মহামান্য প্রিন্স ড. গাযি বিন মুহাম্মাদ বিন তালালকে জানাই বিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রথ মবারের মতো প্রকাশিত এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু মূল গবেষণা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আরও অনেক বড় একটা কাজের অংশবিশেষ মাত্র - যা এখনও সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায়। আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউবিডি প্রেসকে যারা কুয়ালালামপুর ভিত্তিক ইসলামিক বুক ট্রাস্ট (আইবিটি) এবং দি আদার প্রেস - এর সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশে রাজি হওয়ার জন্যে। আইবিটি স্টাফ বিশেষত তুয়ান হজ কয়া কুটটি এবং এন্সিক ইউসুফ সুলতান গ্রন্থটি প্রকাশে তাদের অমূল্য অবদানের জন্যে বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন। সর্বশেষ কিন্তু সর্বনিম্ন নয়, সমালোচনামূলক মন্তব্যের জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রাপ্য সুলতান ওমর আলি সাইফুদ্দিন সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ (এসওএএসসিআইএস), ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী এবং আমার সন্তানরা, যাদের মধ্যে পূর্বোক্তরা আমার কর্মস্থলে এবং শেষোক্তরা ঘরে থেকে তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে।

ওসমান বকর *পিএইচডি*
ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়
ব্রুনাই, দারুসসালাম

১৮ জমাদিউস সানি ১৪৩৭
২৭ মার্চ ২০১৬

সূচি

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
আল-কুরআনে মহাবিশ্বের সংজ্ঞা ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল-কুরআনে মহাবিশ্বের চিত্র বহু কেন? ২৫

তৃতীয় অধ্যায়
মহাবিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় চিত্র ৩১

চতুর্থ অধ্যায়
মহাবিশ্বের স্থাপত্যকলা চিত্র ৭৯

পঞ্চম অধ্যায়
খোদায়ী সাম্রাজ্য হিসেবে মহাজগতের চিত্র ৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
আলো ও আঁধারের জগৎ হিসেবে মহাবিশ্ব ৯৩

সপ্তম অধ্যায়
আল-কুরআনে মানব ক্ষুদ্রমহাজগৎ: মানব অভ্যন্তরে মহাবিশ্ব ১০১

গ্রন্থপঞ্জি ১৭৯

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

আল-কুরআনের আয়নায় দেখা এই মহাবিশ্ব বা মহাজগতের বহুবিধ চিত্র হচ্ছে অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে মানবজাতির প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব হিসেবে আল-কুরআন বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার দাবিদার। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আল-কুরআনের ধারণা যদিও অনেক ও বিভিন্ন, বস্তুত এর সংখ্যা সীমাহীন, যা পরে তুলে ধরা হবে। অত্র গ্রন্থে অবশ্য এগুলোর মধ্যে বোধগম্য সহজতম সীমিত সংখ্যকই শুধুমাত্র আলোচিত হবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এখানে সাকুল্যে গোটা পাঁচেক চিত্র বা ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রতিটি ধারণার মধ্যেই একটা করে ছবি বা চিত্র ফুটে উঠেছে, যাকে আমরা ওই ধারণার প্রতিচ্ছবি বলতে পারি। সেমতে, অত্র গ্রন্থটির প্রধান শিরোনাম হিসেবে আমরা 'আল -কুরআনে মহাবিশ্বের চিত্রসমূহ'- এই নামটিকে বেছে নিয়েছি। প্রতিটি ধারণা বা ছবির পিছনেই রয়েছে আল-কুরআনের বিভিন্ন সুরা থেকে একত্রিত করা কিছু আয়াতের একেকটা গুচ্ছ, যা আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এগুলোর মধ্যে ধারণাগত মিল এবং বিষয়বস্তুগত ঐক্য রয়েছে, শুধু এগুলোর মধ্যেই নয়, বরং মহাবিশ্ব সম্পর্কিত অন্যান্য চিত্রগুলোর সঙ্গেও।

অত্র গ্রন্থে আলোচিত মহাজগতের পাঁচটি চিত্র মহাবিশ্বকে পাঁচটি অনুরূপ ধারায় তুলে ধরে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত প্রথম চিত্রটি যাকে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় চিত্র বা ধারণা বলি, মহাবিশ্বকে একটি সুবিশাল মহাজাগতিক স্থান-সময় কমপ্লেক্স হিসেবে বর্ণনা করে। এটি এমন সব মহাজাগতিক বস্তু দ্বারা গঠিত যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাজাগতিক বিধান দ্বারা পরিচালিত গ্রহ ও তারকারাশির জগতসমূহ, ছায়াপথ ও নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত চিত্রটি যাকে আমরা স্থাপত্যকর্ম বলে বর্ণনা করে থাকি, মহাবিশ্বকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিকল্পিত, নকশাকৃত ও বিনির্মিত একটি স্থাপনা হিসেবে তুলে ধরে। এই চিত্রটিকে সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হবে মহাবিশ্ব এমন একটি চমৎকার স্থাপনা, যার রয়েছে একটি সুষম, সারবান ও অবিভক্ত (Solid) নির্মাণকর্ম, একটি নিখুঁত ও সম্পূর্ণ স্থাপত্য নকশা এবং সুন্দর সাজসজ্জা। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত চিত্রটি মহাবিশ্বকে একটি স্রষ্টার সাম্রাজ্য হিসেবে তুলে ধরে, যার

একদিকে রয়েছে মহান স্রষ্টার আরশ তথা রাজাসন এবং অপরদিকে দূরবর্তী প্রান্তে রয়েছে বস্তুগত জগৎ অর্থাৎ যেখানে রয়েছে পৃথিবী নামক গ্রহ তথা আল্লাহর খলিফা বা মানবজাতির বাসস্থান। চিত্রটির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো কার্যকারণ সম্পর্কীয় মহাজাগতিক সম্পর্কজাল। মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ ও বলের মধ্যে বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল আল্লাহর বিধান দ্বারা এই সম্পর্কজাল সুনিয়ন্ত্রিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত চতুর্থ চিত্রটি মহাবিশ্বকে বিভিন্ন স্তরের আলো এবং আঁধারের জগৎ হিসেবে তুলে ধরে। এ চিত্রের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বে বসবাসকারী সৃষ্ট-জীবসমূহকে দেখতে সক্ষম হই, যারা তাদের মধ্যে বিদ্যমান আলোর মাত্রানুযায়ী প্রাধান্য পরম্পরায় যথাস্থানে স্থাপিত। পঞ্চম এবং সর্বশেষ চিত্রটি যা সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, যাকে আমরা অতিক্ষুদ্র সৃষ্টি সংক্রান্ত জগত (মাইক্রোকসমিক) নামে ডাকি, যা সবগুলোর মধ্যে তুলনাহীন চিত্র বলে প্রতীয়মান হয়। এ চিত্রটি মানুষকে সমগ্র বিশ্বজাহানের একটি নিখুঁত হুবহু নকল হিসেবে তুলে ধরে। অর্থাৎ এটিকে এমন একটি চিত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে, যার মধ্যে অন্য সকল চিত্রও নিহিত রয়েছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় মহাবিশ্বের অসীম সংখ্যক চিত্র বা ধারণা কেন থাকতেই হবে সে মর্মে মৌলিক কারণ ও যুক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরছে। বিষয়টির মৌলিক কারণ অবশ্য অতীন্দ্রিয় কিংবা ধর্মতাত্ত্বিক প্রকৃতির। আল-কুরআন মতে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সমগ্র সৃষ্টিজগত জুড়ে প্রতিভাত। অন্য কথায়, সমগ্র বিশ্বকে আল্লাহর আত্মপ্রকাশ (Gods Self-Disclosure-GSD) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার অর্থ তার নাম ও গুণাবলির প্রকাশ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি যেহেতু অসীম সংখ্যক, যা আল-গাযযালি (১০৫৮-১১১১) এবং ইবন আল-আরাবি (১১৬৫-১২৪০)-র মতো সুফিতত্ত্বে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে, সেহেতু জিএসডি (GSD) নীতির অর্থ হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মতো মহাবিশ্বের চিত্রও আবশ্যকীয়ভাবে অসীম সংখ্যক হতে হবে। আমরা ইবন আল-আরাবির জিএসডি নীতিটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করেছি। তিনি এ নীতিকে তার প্রধান মহাজাগতিক মতবাদ হিসেবে গণ্য করতেন। অত্র গ্রন্থে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের নির্বাচিত পঞ্চ কুরআনি চিত্র অধ্যয়নের জন্য এ নীতি জানা অত্যন্ত উপকারি ও সহায়ক

প্রমাণিত হয়েছে। আগেই বলেছি, এটি আমাদের বৃহত্তর গবেষণাকর্মের অংশমাত্র, যা এখনও সমাপ্ত হয়নি। এ নীতিটি আমাদের সেই বৃহত্তর গবেষণা কর্মের জন্যেও সহায়ক বটে। মহাবিশ্বের অন্যান্য কুরআনি চিত্রসমূহ আমাদের পরবর্তী গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে, যা আগামীতে প্রকাশিত হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের একমাত্র গ্রহলোক আবাস হিসেবে পৃথিবীর চিত্র এবং অংক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হিসেবে নানাভাবে চিত্রিত মহাবিশ্ব, একটা জীবন্ত ব্যবস্থা কিংবা বিশাল মানব (আল-ইনসান আল-কাবির) হিসেবে মহাবিশ্ব, এক মহাজাগতিক ভারসাম্য (মিযান), এক বুদ্ধিমত্তার জগৎ, এক কোয়ান্টাম বিশ্ব, এবং মহাবিশ্বের বাইরে মানুষের আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার সাইনপোস্টসমূহের নির্দেশিকা ইত্যাদি।

মহাবিশ্বের কুরআনি চিত্রসমূহ অধ্যয়নে অত্র গ্রন্থকে কুরআনের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক কর্ম (তাফসির ইলমী) হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তব কথা হলো, যে গবেষণা প্রকল্পের জন্য আমরা জর্ডান হাশেমী রাজ্যের রাজধানী আম্মানস্থ রয়্যাল আল-বাইত ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক থ্যট-এর উদার অনুদান লাভ করেছি, অত্র গ্রন্থটি তার প্রাথমিক ফলমাত্র; যা আসলে পুরোপুরি আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণকর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যাহোক, এ তাফসির শাখার কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিতে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহের প্রয়োগে আমরা একটা বিষয়বস্তুগত কর্মধারা অবলম্বন করেছি। বলা যায়, আমাদের নিকট এটা একদম স্পষ্ট যে আল-কোরআন মহাবিশ্ব এবং এর বিভিন্ন চিত্র ও ছবি মানবজাতির জন্য সুগভীর চিন্তা-ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম আকর্ষণীয় ও মজার বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আমরা সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করেছি যে মহাবিশ্বের কোনো এক বিশেষ চিত্রের সাথে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত আয়াতসমুহের বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরতা ও বিস্তৃতি উভয় দিক থেকে আমাদের জন্য উত্তম জ্ঞানগত ফলাফলের প্রতিশ্রুতি দেয়, তথাকথিত মহাজাগতিক বা সৃষ্টি বিষয়ক (আল-আয়াত আল-কাউনিয়্যাহ) আয়াত অপেক্ষা যা সাধারণত আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমহ্রাসমান জ্ঞান-দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। অধিকন্তু, তৎপরিবর্তে ইসলামের সার্বিক তাওহিদ বা একত্ববাদী জ্ঞান-দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এ রকম বিষয়বস্তুগত কর্মনীতির মাধ্যমে মহাবিশ্বের

অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একীভূত চিত্র পেতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্র গ্রন্থে অবলম্বনকৃত আমাদের পছন্দকৃত নীতিটি সার্বিক অর্থে বিষয়বস্তুগত ও সংশ্লেষী জাতীয়। এ ধরনের কর্মধারায় নাজিলকৃত অধিবিদ্যাগত উপাত্ত ও নীতিসমূহকে বাস্তবে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সাথে সমন্বিত পন্থায় সংশ্লেষ ঘটানো হয়ে থাকে। পূর্বোল্লেখিত জিএসডি নীতির জ্ঞান-দর্শনগত ভূমিকাই হচ্ছে এ কর্মধারার মূল কথা।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের মত হলো যে, অত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যতম প্রধান একটি বিষয়বস্তুর ওপর এক নতুন অধ্যয়ন উপস্থাপন করছে। অত্র গ্রন্থে আলোচিত মহাবিশ্বের কুরআনী চিত্রসমূহ এমন এক ইসলামি মহাজাগতিক বিষয়, যা আজও পর্যন্ত খুব একটা অনুসন্ধান করা হয় নি। কুরআনের এই বিশেষ বিষয়বস্তুগত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এ মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করছি যে, মহাজগৎ তত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থটি এমন নতুন কিছু অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধি জাগাবে যা মহাজগৎ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা সৃষ্টিতে আগ্রহীদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক প্রমাণিত হবে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা, গ্রন্থটির মাধ্যমে আমরা ইসলামি মহাজগৎ তত্ত্ব এবং এর শাখাসমূহ এবং সেই সাথে কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের (তাফসীর ইলমী) জ্ঞান-দর্শন বিষয়ে বর্তমান আলোচনা সম্পর্কে অধিকতর সমসাময়িক ধারণা দিতে নগণ্য কিছু অবদান রাখতে পারবো। অত্র গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত সবগুলো চিত্র বা ধারণা, যা কুরআনে নাজিলকৃত তথ্য-উপাত্তের ওপর সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিশীল। এ কারণে বিষয়টা ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এর সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা সাব- টাইটেল বা পার্শ্ব- শিরোনাম হিসেবে দ্য স্ক্রিপচারাল ফাউন্ডেশন অব ইসলামিক কসমোলজি বাক্যাংশটি বেছে নিয়েছি। *ওয়া বিল্লাহ আল-তাওফিক ওয়াল-হিদাইয়াহ ওয়া বিহি নাস্তাইন*।

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনে মহাবিশ্বের সংজ্ঞা

আল-কুরআন মানবজাতিকে হেদায়াতের পথে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মহাজগৎ তথা মহাবিশ্ব[১] সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও দিয়েছে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আল-কুরআনের ধারণা আল্লাহকেন্দ্রিক। আমরা এর দ্বারা এটাই বুঝি যে, মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ তায়ালার নিরিখেই সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এটি মহাবিশ্বের সংজ্ঞায়নে মৌলিক ভিত্তি প্রদান করে, যা ইসলামি চিন্তার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই গৃহীত হতে হবে। মুসলিম চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত এই সাধারণ সংজ্ঞানুযায়ী মহাবিশ্ব হচ্ছে "আল্লাহ তায়ালা বাদে বাকি সবকিছু" (মা সিওয়া আল্লাহ)।[২] এ সংজ্ঞা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাবিশ্বকে অন্য আরেকটা বাস্তবতার নিরিখে অনুধাবন করতে হবে, যা মহাবিশ্বকে ছাড়িয়ে যায় এবং যা আল্লাহকে উপলব্ধি করে। মহাবিশ্ব এবং আল্লাহর মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান আল-কুরআন তা সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী। এ সম্পর্কের সবগুলোই অধিবিদ্যামূলক, যা ইসলামি মহাবিশ্বতত্ত্বের মৌল উপাদান হিসেবে কাজ করে।[৩]

---

১ ইংরেজি ভাষায় Cosmos I Universe শব্দদ্বয় একই অর্থ বোঝায় এবং উভয়ই একই অস্তিত্ব সম্পর্কিত বাস্তবতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য সঙ্গতি বিধানের স্বার্থে আমরা আমাদের এই গ্রন্থ জুড়ে Cosmos-এর পরিবর্তে Universe (মহাবিশ্ব) শব্দটি ব্যবহার করছি

২ মহাবিশ্বের এ সংজ্ঞাটির বিষয়ে আলোচনার জন্যে দেখুন ওসমান বকর, '*Cosmology,* John Eposito, সম্পাদিত *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York- Oxford University Press, ১৯৯৫), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২২-৩২৩; আরও দেখুন উইলিয়াম সি চিত্তিক, *The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-Arabis Cosmology* (Albany: State Universty of New York Press, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা- XVII-XVIII.

৩ 'ইসলামি মহাবিশ্বতত্ত্বের মৌল উপাদান হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এবং মহাবিশ্বের মধ্যকার বিভিন্ন অধিবিদ্যা সম্পর্কের চমৎকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানতে বিশেষত ইখওয়ান আল-সাফা (চতুর্থ হিজরি/ ১০ম খৃস্টাব্দ), আবু রাইহান মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-বিরুনী (৩৬২ হিঃ/৯৭৩ খ্রীঃ ৪২১ হি/ ১০৩০ খ্রী এবং ইবন সিনা) দেখুন সাইয়্যেদ হুসেইন নাসর, আন ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক কসমলজিকল ডাকট্রিনয (ক্যাম্ব্রিজ, ইউএসএ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪); আরো দেখুন বুলডার: শাম্বালা, ১৯৭৮ সংস্করণ। একই বিষয়ে ইবন আল-আরাবি'র বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন, উইলিয়াম সি চিত্তিক, দ্য সেলফ- ডিসক্লোজার অফ গড।

পারিভাষিকভাবে মহাবিশ্ব বুঝাতে আল-কুরআনে কয়েকটি আরবি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে আল-আলামিন (একবচন: আলাম), আল-খালক, এবং আল-কাউন। বহুবচন আল-আলামিন[৪] শব্দটি কুরআনে এসেছে ৭৩ বার, আবার একবচনে আল-আলাম শব্দটির ব্যবহার একবারও দেখা যায় না।[৫] বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমগ্র মহাবিশ্বকে একটি একক সত্তা বুঝাতে একবচনে আল-আলাম শব্দটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা বাদে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পরিষ্কারভাবে একটি সামগ্রিক অর্থ বোঝাতে এটি অত্যন্ত যুতসই শব্দ। বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করলে আল-কুরআন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যে নানান দুনিয়ার কথা বলে থাকে সেগুলো আসলে এই একক মহাবিশ্বেরই বিভিন্ন অধিজগৎ (Subsystem) মাত্র।

আল-কুরআনে সর্বপ্রথম আল-আলামিন শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কুরআনের উদ্বোধনী অধ্যায় তথা সুরা ফাতিহায় এভাবে: "প্রশংসামাত্রই আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতসমূহের অভিভাবক-প্রতিপালক (*রাব্বুল-আলামিন*- Rabb al-alamin)।"[৬] কুরআনে আল-আলামিন শব্দের সর্বশেষ ব্যবহার দেখা যায় ৮৩ নং অধ্যায়ে (সুরা আল- মুতাফফিফীন- এ) এভাবে: "এমন এক দিন যখন সমগ্র মানবজাতি জগতসমূহের অভিভাবক-প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (*রাব্বুল-আলামিন*- Rabb al-alamin)।"[৭] সত্যিই এ দু' আয়াতে আল-আলামিন শব্দের প্রয়োগে কী চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন! *রাব্বুল-আলামিনের* প্রথম ব্যবহারটি লক্ষ্য করা যায় মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করার সাথে যুক্ত। কেননা তিনিই সমগ্র সৃষ্টিজগতের উদগাতা তথা সৃষ্টিকর্তা, সেই বাস্তব প্রাকৃতিক বিশ্বসহ যেখানে ভাগ্যক্রমে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যে দুনিয়াটির কথা বলা হলো তা আসলে কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে আয়াতে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। ওই সুরার বাকি আয়াতগুলোতেও এটা স্পষ্ট করা হয়নি। কুরআনের অন্যান্য বেশ কয়েকটি আয়াতে অবশ্য পৃথিবী নামক গ্রহকেই মানব অধ্যুষিত বিশ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্রষ্টার মহাজাগতিক পরিকল্পনানুযায়ী

৪ আল-আলামিন শব্দটি আলাম শব্দের সম্বন্ধসূচক কারক, যেমন আল-আলামুন কিংবা আল-আওয়ালিম যার উল্লেখ কুরআনে পাওয়া যায় না।

৫ দেখুন, corpus.quran.com/qurandictionary.jsp.

৬ আল-কুরআন, সুরা ১ (আল ফাতিহা), আয়াত ২।

৭ আল-কুরআন, সুরা ৮৩ (ভেজাল ব্যবসায়ী), আয়াত ৬।

পৃথিবীকেই আদম তথা মানবজাতির অস্থায়ী বসবাসস্থল হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআন বলছে: "আমরা বললাম, তোমরা সবাই নিজেদের মধ্যকার শত্রুতাসহ নেমে যাও এখান থেকে। পৃথিবীই হবে তোমাদের বাসস্থান (মুস্তাকারর) আর জীবিকার্জনের জায়গা কিছুকালের জন্যে।"[৮]

প্রতীয়মান হয়, অত্র আয়াত মানুষকে বলছে যে, পৃথিবী তাদের ক্ষণস্থায়ী গ্রহাবাসই নয় শুধু, বরং পৃথিবী মানব জীবনের জন্যে একমাত্র উপযুক্ত গ্রহ।[৯] এই অস্থায়ী গ্রহাবাসে মানুষের জীবনকে আমরা বলতে পারি তার পার্থিব বা দুনিয়াবি জীবন। এ এমন জীবন যা হতে হবে আল্লাহর কাজ ও তার ইবাদতে সমর্পিত বা নিবেদিত জীবন। অন্য কথায়, মানুষের পার্থিব জীবন হচ্ছে একটা ভ্রমণ স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে পৃথিবী নামক গ্রহে তার অস্থায়ী ঠিকানা তথা বাসস্থানে। আর *রাব্বুল-আলামিন* এর সর্বশেষ ব্যবহার অবশ্য মানুষের ফিরতি যাত্রা তথা মহান প্রভুর নিকট ফিরে যাওয়া এবং সমগ্র মানবজাতির শেষ বিচার দিবসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সাথে সম্পর্কিত। আল-আলামিন কথাটা আল-কুরআনে যত বার উল্লেখিত হয়েছে তার মধ্যে *রাব্বুল-আলামিন* বাক্যাংশটির অংশ হিসেবে এসেছে ৪২ বার (৫৭.৫%), যা ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক কাল থেকে মুসলমানগণের মুখে উচ্চারিত সর্বাধিক জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক সূত্র (Formulae) হিসেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে।

খালক শব্দটির বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে। অবশ্য এর প্রধান বা মুখ্য অর্থটি হচ্ছে সৃষ্টিজগৎ। আল-কুরআনে মোট ৫২ বার এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে ২৭ জায়গায় এটি সমগ্র সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে শামিল রয়েছে মহাজগৎ।[১০] অধিকন্তু, মহাজগৎ অর্থে উল্লেখিত এই ২৭ স্থানের মধ্যে

---

৮ আল-কুরআন, সুরা ২ (আল বাকারা), আয়াত ৩৬।

৯ অন্য একটা প্রবন্ধে আমরা সুদৃঢ় যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাবি করেছি যে, মহাবিশ্ব যতই বিশাল হোক না কেন, পৃথিবীই মানবজাতির একমাত্র গ্রহাবাসস্থল। দেখুন, ওসমান বকরের "Understanding the Challenges of Global Warming in the light of Quran's idea of Earth as our Planetary Home" ; ইমতিয়ায ইউসুফ (সম্প) A Planetary And Golobal Ethics for Climate Change And Sustainable Energy, (Bankok: Konrad-Adenauer-Stiftung. and Mahidol University, 2016).

১০ এই সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের জন্যে দেখুন, corpus.quran.com/qurandictionary.jsp.

আবার ৮ বার উল্লেখিত হয়েছে একই বাক্যাংশে *সামাওয়াত* (আসমান) এবং *আরদ* (পৃথিবী) এর সাথে মিলিয়ে অর্থাৎ *খালক আস-সামাওয়াত ওয়াল-আরদ* (আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি)। প্রথম এ অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

নিঃসন্দেহে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের আবর্তনে, মানুষের কল্যাণে মহাসাগরে জাহাজের অভিযাত্রায়, আসমান থেকে আল্লাহ কর্তৃক বারি বর্ষণে, এভাবে মৃত পৃথিবীতে তিনি যে জীবন দান করেন তাতে, পৃথিবীতে তিনি যে সর্বপ্রকার জীব জানোয়ার ছড়িয়ে দেন, বায়ুর পরিবর্তন করেন এবং আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে বায়ু দ্বারা মেঘমালাকে দাস সদৃশ তাড়িয়ে নেন। বস্তুত এসবের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।[১১]

খালক আস-সামাওয়াত ওয়াল-আরদ এর সর্বশেষ ব্যবহার দেখা যায় এ আয়াতে: "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া তাঁর সৃষ্টজীবসমূহ; তিনি যখনি ইচ্ছা করেন সেগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।[১২] এখানে আমরা আবারও *খালক আস-সামাওয়াত ওয়াল-আরদ* এর ব্যবহার সম্পর্কে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টি জগতে প্রকাশিত আল্লাহর নিদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নিজ অস্তিত্বের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণে মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস হিসেবে। সর্বশেষ বার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে স্রষ্টার নিদর্শনসমূহের তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনের ওপর। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকুল একদিন তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। এ হচ্ছে এ সকল নিদর্শনের অস্তিত্বকালের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা, যা মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণেই প্রয়োজন। অবশ্য সর্বশেষ আয়াতে খালক বা সৃষ্টি কথাটি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তথা সমগ্র মহাজগতের শৃঙ্খলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা পরের সুরায় আল্লাহ বলছেন এভাবে: "তিনিই আল্লাহ যিনি সপ্ত আসমান একটার উপর আরেকটা স্থাপন করে সৃষ্টি করেছেন। সর্বমহানুভব আল্লাহ (*খালক আর-রাহমান*) সৃষ্টির মধ্যে তুমি কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। তাহলে তোমার দৃষ্টি আবারও ফিরাও, কোনো ত্রুটি কি লক্ষ্য করো? (*ফুতুর*)"[১৩]

---

১১ আল-কুরআন, সুরা ২ (বাকারা), আয়াত ১৬৪

১২ আল-কুরআন, সুরা ৪২ (শুরা), আয়াত ২৯

১৩ আল-কুরআন, সুরা ৬৭ (মুল্ক), আয়াত ৩

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক আমাদের বর্তমান এই কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে এ আয়াতকে অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত আল-কুরআনের সুরা ফাতিহায় যে ষোলটি মৌলিক ধারণা দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর এই নামটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এখানে সপ্তাকাশ সৃষ্টি প্রসঙ্গে। *আর-রাহমান* (চূড়ান্ত কল্যাণময় এবং দয়াময়), এবং *আর-রাহীম* (চূড়ান্ত দাতা) এ নাম দুটি সুরা ফাতিহায় এক সঙ্গে এসেছে যা আল্লাহর রহমতের (রাহমাহ) দুটি ভিন্ন দিক বা রূপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।[১৪] আর-রাহমান সৃষ্টিশীল রহমতকে নির্দেশ করে আর আর-রাহীম সুরক্ষা নির্দেশক। আল্লাহর জাত ও সিফাত আর-রাহমান সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যেই প্রতিভাত। আর- রাহমান হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম রহমতে সৃষ্টিজগতের সমস্ত সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টজীব তাঁর সৃষ্টির যথার্থতা প্রমাণ করুক বা না করুক।

সুরা ফাতিহায় আর-রাহমান নামটি এসেছে আল্লাহর সৃষ্টিশীল রহমতের (১:২) প্রকাশ হিসেবে, মহাজগতের সাথে সম্পর্কের নিরিখে। কুরআনের অন্যান্য অংশে এ নামটি ৫৭ বার পুনরুল্লেখিত হয়েছে। আল-কুরআনের পুনরাবৃত্তিমূলক [১৫] বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর-রাহমান নামটি এসেছে সপ্ত আসমান সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে (৬৭:৬)। আয়াতখানি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাত আসমানকে খালক আর-রাহমান তথা সর্বমহানুভব পরম করুণাময়ের সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করে এবং সুরা ফাতিহায় (১:২) তা আরও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে। আকাশমণ্ডলীকে বর্ণনা করে এক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিশীল রহমতের অন্যতম প্রকাশকে ব্যাখ্যা করে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দাবি যে তিনি নির্ভুলভাবে আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন সেটা মানুষকে যাচাই করে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দ্বিতীয়বার মানুষকে এটি যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে: "কোনো খুঁত কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ?" নিজের সৃষ্টিকর্ম

---

১৪ আর-রাহমান ও আর-রাহীম শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, আল-গাযযালি, The Ninety Nine Beautiful Names of God, পৃষ্ঠা ৫২-৫৭।

১৫ মাছানিয়ান (Mathanian) শব্দটি আমরা কুরআনি পরিভাষা mathani (মাছানি) থেকে গ্রহণ করেছি। এর অর্থ হলো, কোনো মতবাদ বা বক্তব্য বহুরূপে পুনরাবৃত্তি করে প্রকাশ করা। দেখুন, আল-কুরআন, সুরা ৩৯ (যুমার/লোকারণ্য), আয়াত ২৩। আমাদের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের পুনরাবৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য মতবাদ এ আয়াতেই স্পষ্ট।

কতটা নিখুঁত-নির্ভুল তা যাচাই করে দেখার জন্যে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি কী চমৎকারই না এ আহ্বান!

প্রসঙ্গক্রমে সুরা মূলকের তৃতীয় আয়াত (৬৭:৩) উল্লেখযোগ্য। কুরআনে বিধৃত মহাজগতের বিভিন্ন চিত্রের অস্তিত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে এ আয়াতেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব চিত্রের অন্যতম হলো যাকে আমরা বলে থাকি "স্থাপত্যকলা চিত্র" যা অত্র গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ চিত্রে মহাবিশ্বকে একটি স্থাপত্যকর্ম হিসেবে দেখা হয়, যাতে রয়েছে নিখুঁত ও সুন্দর নকশা ও নির্মাণশৈলীর ছাপ। আয়াতখানি মানুষের একমাত্র গ্রহাবাস হিসেবে পৃথিবী গ্রহের ওপর আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। ওই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করবো যে, আমাদের গ্রহাবাসের নিখুঁত ছাদ হিসেবে আকাশমণ্ডলীর কোনো জুড়ি নেই।

আল-খালক এবং আল-আলামিন বলতে যে মহাবিশ্বকেই বুঝানো হয়ে থাকে তা পরিষ্কার করতে নিম্নোক্ত আয়াতই যথেষ্ট। এটি যেমন শিক্ষণীয় তেমনি যথার্থ। অন্যভাবে এর আরও যেসব তাৎপর্য রয়েছে সেগুলোর এখানে উল্লেখ করছিনা।

আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক-প্রতিপালক, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে; অতঃপর তিনি সুদৃঢ়ভাবে সমাসীন তাঁর (কর্তৃত্বের) আরশের উপর। তিনি দিবসকে রাতের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এরা দ্রুতগতিতে একে অপরকে অনুসরণ করতে পারে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র, আর গ্রহ-নক্ষত্ররাজি; এরা সবাই তাঁর আজ্ঞাধীন বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টিকর্ম ও এগুলোর বিষয়াদি কি তাঁরই এখতিয়ারাধীন নয়? মহিমাময় আল্লাহই বিশ্বজগতসমূহের (*আল-আলামিন*) পরম যত্নকারী এবং প্রতিপালক![১৬]

এ আয়াতে আমাদের তাৎক্ষণিক কৌতূহলের বিষয় হলো যে, *আল-খালক* এবং *আল-আলামিন* উভয় শব্দ দ্বারা মহাবিশ্বকেই বুঝানো হয়েছে। আয়াতের গঠন থেকে এটা স্পষ্ট যে, *আস-সামাওয়াত ওয়াল-আরদ*, *আল-খালক* এবং *আল-আলামিন* সবগুলো শব্দই সামগ্রিকভাবে ওই একই বস্তু তথা মহাবিশ্বকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, উপরে উল্লেখিত সুরা মূলক (৬৭)-এর ৩য়

১৬ আল-কুরআন, সুরা ৭ (আল-আ'রাফ), আয়াত ৫৪।